

Gillette স্নায়ুবিজ্ঞান

(একজন রোগীর চোখে)

“ক্লিনিক রোগীদের সারিয়ে তোলে। যত্নশীল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।”

I. স্নায়ুর রোগ

সবাই ভয় পেত হৃদয় হারানোর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী হৃদয়কেই ভাবা হত জীবনের কেন্দ্র, অনুভূতি, শক্তি আর সাহসের আসন। হৃদয় থেমে গেলে সব শেষ।

তারপর মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করল, আরও একজন শাসক আছে।

নীরব।

অদৃশ্য।

সর্বময়।

মস্তিষ্ক।

পরিবার, বন্ধু, চেনা মানুষ, প্রজন্মের পর প্রজন্মের চলে যাওয়া আর রোগের এসে পড়া — এটুকু লক্ষ করলেই একটা সরল সত্য বোঝা যেত: সবকিছু চালায় মস্তিষ্ক।

প্রতিটি নড়াচড়া।

প্রতিটি শব্দ।

প্রতিটি স্মৃতি।

প্রতিটি আশা।

মস্তিষ্ক যখন বদলে যায়, তখন শরীরের শুধু একটা অংশ কষ্ট পায় না। কষ্ট পায় মানুষের গোটা ব্যবস্থাটাই।

দীর্ঘদিন এর জবাব ছিল ভয়।

স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত মানুষদের আলাদা করে রাখা হত, লুকিয়ে রাখা হত; তাদের বোঝা হত সামান্যই, সাহায্য করা হত তারও কম। বিরাট এক বোঝা পরিবারগুলো একাই বইত। চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ছিল সীমিত, আর এদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান প্রায় ছিলই না।

মনে হত, এ এমন এক লড়াই যাতে হার অবধারিত।

তারপর এল বোঝার সময়।

মানুষ বুঝল, তার সামনে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ঘটনা নয়, বরং তার নিজের অস্তিত্বেরই বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটা।

পারকিনসন্স।

আলঝেইমার্স।

অবক্ষয়জনিত রোগ।

স্নায়ুর আঘাত।

ট্রমা।

বিরল রোগ।

জন্মগত ব্যাধি।

নাম আলাদা, বাস্তবটা একই: যে অঙ্গ আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ চালায়, তারই ভঙ্গুরতা।

সেই মুহূর্ত থেকে স্নায়ুবিজ্ঞান আর নিছক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা শাখা রইল না।

হয়ে উঠল সবার দায়িত্ব।

স্নায়ুর রোগ দরজায় টোকা দেয় না।

সে মানুষের জীবনে ঢুকে পড়ে আর খেলার নিয়ম বদলে দেয়।

II. কেন?

স্নায়ুর রোগ নিয়ে বেঁচে থাকার মানে কী, তা বোঝাতে:

যে শরীর সাড়া দেয় না;

সীমাবদ্ধতা;

পরনির্ভরতা;

নিজের মতো চলার ক্ষমতা হারানো;

স্বাভাবিকতার নতুন সংজ্ঞা।

রোগ নয়।

অসুখকে ঘিরে জীবন। অন্যদের ঘিরে জীবন।

বোঝাটা যে বয়, সে প্রায় কখনওই রোগী নয়। রোগী অনেক সময় লড়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রটা পুরোপুরি না বুঝেই। আর যে পাশে থাকে, সে দেখে সময়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে, আর শেখে — জিতে নেওয়া প্রতিটি দিনের দাম বড় বড় প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি।

রোগ পথ বদলে দিতে পারে। মানুষটার মূল্য মুছে দিতে পারে না।

ভালোবাসাই এর আসল অংশ, যেকোনো নিছক জয়ের ঊর্ধ্বে — আর নিজের কপালে কী আছে, তা কেউ কোনোদিন জানবে না।

আমি নিজে এর ভেতর দিয়ে গেছি: বাইপোলার ডিসঅর্ডার, মাত্রা অনির্ধারিত; শেষমেশ দেখা গেল সেটা আর কিছুই নয়, ছেলেবেলার এক অতিসতর্কতা, যার কারণ আমার মা — “মার আর পিঠে খেয়েই ছেলেপুলে সুন্দর হয়”, এই পুরোনো প্রবাদ মেনে তিনি আমাকে চড়-থাপ্পড়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন আর আমার মগজের ইকুয়ালাইজারটা চালু করে দিয়েছিলেন।

ঘটনা ঘটার আগেই বুঝে ফেলা — অথচ আমি জাদুকর নই, সাধুপুরুষ নই, অলৌকিক কাণ্ড ঘটানোর লোকও নই।

তবু যারা কষ্ট পায় তাদের কাছাকাছি — মা আর বাবা দুজনকেই আলঝেইমার্সে হারানোর পর, আর সেই প্রশ্নের পর: কিন্তু এ কে? একে তো আমি চিনি না।

III. উপসংহার

ক্লিনিক একটা ভবন।

যত্নশীল সমাজ তার চেয়ে বেশি কিছু।

এ হল তাদের রোজকার সাক্ষাৎ — যারা কষ্ট পায়, যারা সঙ্গ দেয়, যারা সেবা করে, আর যারা এমন একটা জায়গা গড়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, যেখানে আশা বদলে যেতে পারে পদ্ধতিতে, অঙ্গীকারে আর সম্ভাবনায়।

এই পাতাগুলো কোনো ভবনের কথা বলে না।

বলে সেই মানুষদের কথা, যারা তার ভেতর দিয়ে যায়।

প্রতিদিন।

IV. লেখকের পাতা

এই লেখা কারও ফরমায়েশে লেখা হয়নি।

এটি বিক্রি করা হয়নি।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়নি।

এটি লেখা হয়েছে পুনর্বাসনের, মানুষের মর্যাদার আর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মূল্যের সাক্ষ্য দিতে।

একমাত্র যে পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে, তা প্রতীকী এক ডলার — কাজের দাম হিসেবে নয়, বরং যত্ন, আশা আর দায়িত্বের সংস্কৃতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবে।

ফের্দিনান্দো